জামতলাবাসীর সেকাল-একাল

সেকালে জামতলা গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। সন্ধ্যা হলে সবাই ঘরে সন্ধ্যা বাতি জ্বালাত। দুই একটা ধনি পরিবার হারিকেন জ্বালাত। বেশিরভাগ পরিবার কুপিবাতি বা দোয়াত জ্বালাত। সাদা কেরাসিন তেল দিয়ে হারিকেন আর লাল কেরাসিন তেল দিয়ে কুপি জ্বালানো হত। মাটির, কাঠের ও পিতলের তৈরি গাছার উপর কুপি রাখা হত। কেউ কেউ পিতরাজ বিচি থেকে তেল বানিয়ে সেই তেল দিয়ে প্রদ্বীপ বা চাটি জ্বালাত। খুদি খুদি মোমবাতি জালাত জুম্মাঘরে। কৃপণ ও গরীবরা বেলাডোবার আগেই রাতের খাবার খেয়ে নিত। তারা রাতের অন্ধকারে কখনো প্রথম লোকমা খেয়ে একটা শুকনা ভাজা মরিচে কামড় দিয়ে হাহু করতে করতে খাবার শেষ করে ফেলত। সকালে খেত পান্তাভাতে কাচা মরিচ ও পেয়াজ। কৃষকরা দুপুর বেলা পর্যন্ত প্রখর রৌদ্রে হাল লাংগল চাষ করতো। বৌ বা ছেলা মেয়ারা এক হাতে এক জগ বা এক বদনা পানি আর এক হাতে এক থালি পান্তাভাত নিয়ে মাঠে যেত। ওখানেই তারা হিজল গাছের তলায় বসে খেত। রাখাল ছেলে ছায়ায় বসে বাঁশের কুলুলুলু বাশী বাজাত। কয়েকজন রাখাল মিলে তাদের লাঠি দিয়ে কোপ্পা খেলত। মাঠ থেকে ধান কেটে বাশের বাইকে কাধে করে বা গরুর গাড়ী করে ধান বাড়ীতে আনা হত। উঠানে গোল করে ধানসহ গাছ ছড়ায়ে মলন দেয়া হত। চার পাচটি গুরু সারিবদ্ধভাবে এগুলি মারিয়ে ধান বের করত। দুর্বল গাভীটি সেন্টারে থাকত। এটাকে বলা হত মেউয়া। মাঝখানে থাকত বলদ ও সাড় গরু। চঞ্চল গুরু থাকত সবার ডানে। রাস্তায় গরুরগাড়ী চলত কাচা হালট দিয়ে। সন্ধার সময় রাস্তা দিয়ে ধুলা উড়িয়ে গরুর পাল বাড়ীর দিকে আসত। পাখীর ঝাক ফিরে আসত গাছের বাসায়। নৌকা ভরে ধান কেটে নিয়ে আসত কৃষক। সারাদিন হাসগুলি বিলের পানিতে সাতার কেটে সন্ধায় বাড়ী ফিরত। ফিরতে দেরী হলে মেয়েরা ডাকত "আয় আয়, ততি ততি"। ততিগুলি পেক পেক করতে করতে খোয়ারে ঢুকতো। কোন কোন হাস রাতে বাড়ী ফিরত না। পাগার পারে রাতে ডিম পারতো। খুব সকালে পোলাপানরা ডিম কুরিয়ে আনত। ডিমকে তারা বলত আন্ডা। কুরিয়ে পাওয়া আন্ডা বিক্রি করে তারা জিলাপা ও নইটানা খেত। গাং ও খাল দিয়ে বড় বড় নৌকা রংগীন রংগীন পাল তুলে পাট নিয়ে যেত। মাঠের চামারা ধান ক্ষেত দিয়ে দাড়া তৈরি করে ছোট ছোট ছৈ আলা নৌকা ও ডিংগি নৌকা যেত। কেউ কেউ লুংগি ও চাদর দিয়ে পাল তৈরি করত। ছোট ছোট মেয়েয়া পিচ্চি কোলে নিয়ে পালতোলা নৌকা দেখে আনন্দ পেত। সুর করে বলত "বাদাম আলা নাওরে পান খাইয়া যাও, আমাগো পিচ্চিটারে ঘুম দিয়া যাও"। কিশোর পোলাপানরা সারাদিন ডিংগি নৌকা নিয়ে বিলে খেলা করত। শাপলা, শালুক, ঢেপ তোলত। পায়খানা প্রশ্রাব বিলেই করে দিত। তৃষ্ণা পেলে বিলের পানিই খেত অঞ্জলি দিয়ে। সবাই নৌকায় চরে হাটে যেত বর্ষা কালে। মেম্বরের লোকেরা রিলিফের গম, আটা, ভুট্টা ও বিলাতি দুধ দিত পাড়ার মাঝখানে নৌকা বেধে। গরীবরা কাড়াকাড়ি করে সেগুলি নিত। মেম্বর খুব ভাল লোক ছিল। তাই পর পর অনেকবার তাকে ভোট দিয়ে মেম্বর বানিয়েছে। মেয়েরা ঘরের পিছনে আড়ায় পায়খানা করত। শোলার বেড়ার আড়ালে প্রশ্রাব করত। ছেলেরা পায়খানা করত রাতের বেলা ইটা ক্ষেতে। অথবা ভোরের বেলা পুকুরের ওপারে। মাঠের লোক চিনে ফেললে লজ্জা পাবে তাই মাথা নিচু করে পায়খানা করত। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত "চাচী, চাচা কোথায় গেছে"। চাচী বলত "ঘাটউদ্ধারে গেছে। " মানে ঘাটের ওধারে পায়খানা করতে গেছে। পায়খানা করে সুযোগ বুঝে পুকুরের ঘাটেই সুচু করত। ওই পানিই তারা খেত। অই পানিতেই গোসল করত। অই পানিতেই গরু ধোয়াত। অই পানিতেই হাস সাতার কাটত, পোলাপান নল খলত। কত যে হাসের পায়খানা তাদের পেটে গিয়েছে! ঝোপে পায়খানায় গেলে বলত বাইরে গেছে। জৈসঠ মাসে মানুষ সমান পাট বড় হইত। এই সুজুগে মানুষ পাট ক্ষেতে পায়খানা করত। অনেক সময় ক্ষেতের বাতরেই পায়খানা করে দিত। নরম, পাতলা ও শক্ত বিভিন্ন ডিজাইনের পায়খানা দেখা যেত। কেউ কেউ রাতের অন্ধকারে পারা দিয়ে পিছলা খেত। পায়ের সাথে লেগে গেলে বাড়ীতে এসে দুরগন্ধ পেয়ে টের পেত। শীতকালে শিশুরা মুলা ক্ষতে পায়খানা করত। বসে মুলাও খেত। মোকা হাজী গ্রামের সবচেয়ে ধনী লোক ছিল। লেখাপড়া জানতো না। তিনবার হজ্জ করেছে গুনাহ মাপের জন্য। গ্রামে স্কুল, মাদ্রাসা ও

জুম্মাঘর করে দিয়েছেন। তাই গ্রামের অনেকের ছেলেরাই লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু নিজের ছেলে পড়ে নাই।

আর এখন? সেই গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। কুপি নেই। এল ই ডি লাইট। হালট পাকা সড়ক হয়েছে। বাড়ী বাড়ী মুরগীর খামার হয়েছে। বেশ কিছু মেধাবী ছেলে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে বড় বড় পদে চাকরী করছে। কেউ কেউ শহরের বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করে শহরে বাড়ী করে গ্রামের কথা ভুলে গিয়ে দিব্বি আরামে আছে। কেউ কেউ স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। তারা মোকা হাজীর জন্য একটু দোয়াও করে না। সেখান থেকে আসার সময় নেই। বাবা মার জন্য টাকা পাঠান। সেই টাকা পেয়ে বাবামা গর্ব করে। কিন্তু কাছে পায় না। গ্রামে গরীবের বন্ধু নামে চড়া সুদে টাকা ঋণ দেয়ার সমিতি আছে। গরীব ছেলেরা সুদে টাকা ঋণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি নিয়ে প্রায় সবাই। তারা সাধারণত ৫/৬ বছর পর পর ২/৩ মাসের জন্য বাড়ীতে আসে। মায়ে এসে পরতে বলে। বোউ মানা করে। কারন, এসে এদেশে কি করবে? সন্তান কোচিং সেন্টারে পড়াব কেমনে? প্রবাসীদের সন্তানরা অনেকেই বেশী টাকা খরচ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে দেশে ও বিদেশে। প্রবাসীর মা, বৌ অনেকেই নানা ধরনের সমস্যায় ভুগেন। প্রবাস থেকে ফোন করে "যত টাকা লাগুক চিকিৎসা কর"। শহরে যায় ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে। জানালা দিয়ে প্রবাসীর মা জিগায় "এই যে গো, এনু বাইরে যাওয়া যাবে?"
- আপনি তো বাইরেই আছেন।
- মানে একটু প্রশ্রাব করমু।
- ভিতরে আসেন।
অনেক টাকার পরীক্ষা নিরিক্ষা করে ডাক্তার মন ভাল থাকার কিছু ঔষধ লিখে দেন।

এখন এই গ্রামে, কৃষক নেই। যারা কৃষক হবার কথা ছিল তারা প্রবাসী। হাল নেই। গুরু নেই। আছে পাওয়ার ট্রিলার। মলন নেই, আছে মারাই মেশিন। ধুলা নেই। খেলা নেই। রাখাল নেই। নৌকা নেই। বাদাম নেই। নইটানা নেই। জিলাপা নেই। আছে সেভেন আপ। আছে চা। ততি নেই। আছে মুরগীর দুরঘন্ধযুক্ত খামার। হাট নেই। সাপ্লাইয়ার বাড়ীতে বাড়ীতে জিনিসপাতি দিয়ে যাচ্ছে। বৌরা টিভি চেনেলে বিদেশী সিরিজ দেখছে। ফ্রিজ আছে, টাইলস করা পাকা বাড়ী। বাইরে যেতে হয়না। পানির পাম্প টেপ, কমোড সব আছে। ছেলেমেয়েরা ইউটিউব দেখে, ফেইসবুক করে।

সেই রকম মেম্বর নেই । এখনকার মেম্বারকে উপরে থেকে নমিনেশন দেয়া। তার ছবি বড় বড় নেতার নিচে গাছে গাছে সোভা পাচ্ছে। ভোট তাকে দিতেই হবে। তাকে গম, ভুট্টা, দুধ দিতে হয় না। গ্রামের সবাই চাঁদা দিয়ে রাস্তা, ব্রিজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, জলসা ইত্যাদি করে। সেখানে মেম্বার উদ্ভোদন করেন। ফেইস বুকে পোস্ট দেন। অনুসারীরা লাইক কমেন্ট করেন।
এখন জামতলা গ্রামের সবাই আগের চেয়ে অনেক ভাল আছে। তার পরও কেন যেন মনে হয় আগের মত নেই।

=====
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
গ্রামীণ ভাবনা
৯/৬/২০১৭